অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় সুফি ভাবধারার প্রভাব

মোহাম্মদ মীর সাইফুদ্দীন খালেদ চৌধুরী

সারসংক্ষেপ : দক্ষিণ এশিয়ায় ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসারে সুফি দরবেশগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সপ্তম শতকে ইসলামের প্রচারে দক্ষিণ এশিয়া তথা বাংলায় সাহাবাগণের আগমণের প্রমাণ পাওয়া যায়। পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে শত শত সুফি দরবেশ ও তাদের অনুগামী শিষ্যরা দক্ষিণ এশিয়া তথা বাংলায় আগমণ করেন এবং বিভিন্ন শহর ও গ্রামাঞ্চলের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েন। এসকল সুফীগণের অনুপম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, অসামান্য নৈতিকবল এবং দুঃস্থ মানুষের জন্য গভীর অনুভূতি ও সেবা অমুসলমান জনসাধারণকেও তাঁদের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট করে। ইসলামের উদারতা ও সাংস্কৃতিক প্রাধান্য, সাধারণ মানুষের প্রতি সমঅধিকারের বার্তা এদেশীয় হিন্দু, বৌদ্ধসহ সকল শ্রেণীর মানুষকে নূতন ধর্ম ইসলামের প্রতি আকৃষ্ঠ করেছে। ভারতীয় তথা দক্ষিণ এশিয় সংস্কৃতি এবং ইসলামের সংস্কৃতির মিথষ্ক্রিয়ায় এদেশের সমাজ ও সংস্কৃতিতে নূতন মাত্রা যোগ করেছিল। হিন্দু সমাজের বর্ণপ্রথা এবং নিম্নবর্গের মানুষের প্রতি নিযার্তন ও অবজ্ঞা ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হতে থাকে। ভারতে সুলতানি আমলে শিক্ষা সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। এমনকি সমাজে ইসলাম ধর্মের প্রচ্ছন্ন প্রভাব থেকে হিন্দু ধর্মকে বাচাঁনোর জন্য সংস্কার আন্দোলন শুরু হয় এবং কৌলিন প্রথা উচ্ছেদ করা হয়। দক্ষিণ এশিয়ার সমাজজীবনে ধর্মীয় সহাবস্থান ও সম্প্রীতির সৃষ্ঠি হয়। যাকে আমরা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি (Communal Harmoy) বলে থাকি। মুসলিম শাসকগণও অসাম্প্রদায়িক চেতনায় রাজ্য/ সাম্রাজ্য পরিচালনা করেছেন। দক্ষিণ এশিয়ায় মুসলিম শাসকদের দীর্ঘকাল শাসন ও উন্নতির মূলে রয়েছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এবং সামাজিক স্থিতিশীলতা। উনিশ শতকে বাংলার একমাত্র স্বতন্ত্র মাইজভান্ডারি তরিকার প্রবর্তক গাউসুল আযম মওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভান্ডারির (ক.) (১৮২৬-১৯০৬) আবির্ভাব দক্ষিণ এশিয়া তথা বাংলার সমাজ, সংস্কৃতি ও রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রেখেছে। বিশেষত মাইজভান্ডারি তরিকার সপ্ত উসুল পদ্ধতি, মাইজভান্ডারি মরমীগান এবং অসাম্প্রদায়িক চেতনা এদেশের সকল স্তরের মানুষকে আকৃষ্ট করেছে। আলোচ্য প্রবন্ধে দক্ষিণ এশিয়ায় তথা বাংলায় ইসলামের প্রচার, সমাজ, সংস্কৃতি ও রাজনীতিতে, মাইজভান্ডারি ও অন্যান্য তরিকার প্রভাব এবং অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গঠনে সুফি ভাবধারা ও দর্শনের প্রভাব রয়েছে কিনা তা যাচাই করা হবে।

আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক শৃংখলার মাধ্যমে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের জন্য ইসলামে যে মরমী ভাবধারার উৎপত্তি হয় সেটাই সুফিবাদ। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন 'আমি নিশ্চয়ই তাহাদের অতি সন্নিকটে আছি। কোন আহবানকারী যখন আমাকে আহবান করে আমি তার আহবানে সাড়া দিয়ে থাকি'।[১] আল্লাহপাক অন্যত্র ইরশাদ করেন, 'তিনি আদি ও অনন্ত, প্রকাশ্য ও গুপ্ত, তিনি সর্বজ্ঞাতা'।[২]

আল্লাহর নিগুঢ় রহস্য অনুসন্ধান, আত্মার পবিত্রতা এবং আল্লাহর সাথে মানবাত্মার মহামিলনের উপর ভিত্তি করেই এ সুফিবাদের পথ পরিক্রমা। ইমাম আল কুশাইরি হতে আল্লামা ইকবাল পর্যন্ত অনেক মুসলিম চিন্তাবিদ পবিত্র কোরআনকে সুফীবাদের মূল উৎস বলে নিদের্শ করেছেন।[৩]

সুফিবাদের নামকরণ ও উৎপত্তি প্রসঙ্গে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত হয়। প্রথমত: 'সুফি' শব্দটি 'আস্সফা' হতে উদ্ভূত বলে মনে করা হয়। যার অর্থ পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা।

দ্বিতীয়ত : 'সুফি' শব্দটি 'আস-সূফু' থেকে উদ্ভূত বলে মনে করা হয়, যার অর্থ যিনি পশমের কাপড় পরিধান করেন, তাঁকে সুফি বলা হয়। বস্তুত অমসৃন পশমের পোশাক গ্রহণ অনাড়ম্বর জীবন যাপনের

প্রতীক। নবী (স:), সাহাবী, তাবেয়িন ও তাবে তাবেয়িনগণের অনুসরণে বিনয় ও নম্রতার প্রকাশে সুফিগণ পশমী কাপড় পরিধান করতেন।[৪]

তৃতীয়ত: 'সুফি' শব্দের মূল 'আস-সূফ'। যার অর্থ একমুখী হওয়া। কোনো একদিকে পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া। এ অর্থে সুফি সৌভাগ্যবান ব্যক্তি, যিনি আল্লাহর দিকে একমুখী মনযোগী হওয়ার দুর্লভ সৌভাগ্য অর্জন করেছেন।[৫]

চতুর্থত: 'সুফি' শব্দটি 'আস-সুফ্ফা' হতে এসেছে; শেহাবুদ্দিন সোহরাওয়ার্দী (রহ.) এর মতে, সুফফা শব্দটি 'আসহাবে সুফ্ফার' সাথে সম্পর্কিত। এ সকল সাহাবাগণ রাসুল (স:) এর নিকট হতে সরাসরি দীক্ষাপ্রাপ্ত প্রথম সারির সুফি সাহাবা এবং তাঁদের সংখ্যা প্রায় চারশত জন। যারা সর্বদা মসজিদে নববীতে অবস্থান করে মুহাম্মদ (স:) কে অনুসরণ করতেন।[৬]

পঞ্চমত: 'সুফি' শব্দটি 'আস-সফ' থেকে এসেছে। যার অর্থ কাতার বা সারি। ইমাম কুশাইরি (রা:) বলেন, 'সুফি' শব্দটির উৎপত্তি 'আস-সফ' শব্দ থেকে হয়েছে কারণ, সুফিদের অন্তর যেন আল্লাহর দরবারে উপস্থিত ক্ষেত্রে প্রথম কাতারভুক্ত।

অতএব, পবিত্রতা অর্জন, আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্তির ব্যাকুলতা, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের অবিরত প্রচেষ্ঠায় সাদাসিধা জীবনযাপন এবং পার্থিব জগতের সুখ ও সমৃদ্ধি থেকে মুক্ত হয়ে ইনসান-ই কামিলে (পূর্ণমানব) এ পরিণত হওয়ার নামই সুফি। মূলত: তাওবা (অনুতাপ), তাওয়াককুল (নির্ভরশীলতা), পরিবর্জন, সবর (ধৈর্য্য), আত্মসর্মপন, এখলাস (পবিত্রতা), ইশকে খোদা (খোদা প্রেম), জিকর (স্মরণ), শুকর (কৃতজ্ঞতা), কাশফ (অতীন্দ্রিয় অনুভূতি), সামা (সঙ্গীত), আধ্যাত্মিক জ্ঞান এর মাধ্যমে ফানা ও বাকা স্তরে উপনীত হওয়াই একজন সুফির চুড়ান্ত লক্ষ্য। এ স্তরে সুফি সাধকগণ প্রবৃত্তি ও কামনার মায়াজাল ছিন্ন করে ঐশী সত্তায় প্রদীপ্ত হন। ইমাম হাসান আল বসরী (মৃত্যু, ১১০ হি.), সুফিয়ান সাওরী (মৃত্যু, ১৬১ হি.), জাবির বিন হাইয়ান (মৃত্যু, ১৬৪ হি.), ইব্রাহিম বিন আদহাম (মৃত্যু, ১৬১ হি.), রাবেয়া আল বসরী (মৃত্যু, ১৬০ হি.), দাউদ আততায়ী (মৃত্যু, ১৬৫ হি.) প্রমুখ ইসলামের প্রথম যুগের সুফি। সুফিবাদ সর্বসাধারণের মধ্যে হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষভাগে বিস্তার লাভ করে।[৭]

সুফিবাদকে মতবাদ বা দর্শন হিসেবে সাধারণ জনগণের নিকট উপস্থাপন করেন জুনুন মিসরী (মৃত্যু, ৮৬০ খ্রি.)। তিনি একজন প্রজ্ঞাবান সুফি ও দার্শনিক। তিনি 'হাল' ও 'মকাম' স্তর সম্পর্কিত মতবাদ প্রর্বতন করেন। পরবর্তীতে জুনায়েদ বাগদাদী (মৃত্যু, ৯১০ খ্রি.), আশ শিবলী (মৃত্যু, ৯৪৬ খ্রি.), বায়জীদ আল বোস্তামী (মৃত্যু, ৯২), আবু নছর সিরজি (মৃত্যু, ৯৮৮ খ্রি.), ইমাম আল কুশাই (মৃত্যু, ১০৪৫ খ্রি.) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। ইমাম আল গাজালি (মৃত্যু, ১৬৫২ খ্রি.) প্রমুখের দার্শনিক চিন্তা ও তৎপরতায় সুফিবাদ 'সুফি দর্শন' হিসেবে পরিপূর্ণতা লাভ করে।[৮] ইমাম আল গাজালি সুফিবাদ ও গোঁড়া ধর্মীয় মতবাদের সমন্বয় ঘটায় এবং সুফিবাদ সাধারণ মুসলিম জনগণের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হয়। ইমাম আল গাজালীর প্রচেষ্ঠায় সুফিবাদ সুন্নী মাজহাবে অর্ন্তভুক্ত হয় এবং বৈজ্ঞানিক রূপ ধারণ করে। সৈয়দ দেলওয়ার হোসাইন মাইজভান্ডারীর মতে, 'বাংলাদেশের মাইজভান্ডারি দর্শনের 'সপ্তকর্ম পদ্ধতি'ও মানুষের জীবন যাত্রাকে সহজ এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের পথকে সুগম করেছে। এ সপ্তপদ্ধতি 'ফানায়ে নফছী' বা 'প্রবৃত্তির বিনাশ' এবং 'বাকাবিল্লাহ'র বিভিন্ন উছুল বা পদ্ধতির মধ্যে তুলনামূলকভাবে সহজসাধ্য ও ঝামেলামুক্ত'।[৯]

সপ্তম শতকে আরবে ইসলাম ধর্ম প্রবর্তনের পর থেকে মুসলমানরা ইরান, ইরাক, সিরিয়া, তুর্কিস্থান, আফ্রিকা, মধ্য এশিয়া এবং ইউরোপে নানা জাতির সংস্পর্শে আসে। কিন্তু ভারতে মুসলমানরা এমন

এক জাতির সংস্পর্শে আসে যাদের ধর্ম, ভাষা, সংস্কৃতি এবং দৈনন্দিন জীবনধারা প্রভৃতি কোনো কিছুর সঙ্গেই মুসলমানদের মিল ছিল না। খ্রিষ্টপূর্ব অব্দে মৌসুমী বায়ু আবিষ্কারের পূর্বে ভারত মহাসাগর হয়ে ভারতের সাথে আরবদের বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল।[১০] ভারতীয় এবং আরব ব্যবসায়ীদের এডেন বন্দর ও লোহিত সাগর হয়ে ভারত মহাসাগরের মাধ্যমে ভারতের বিভিন্ন বন্দরসমূহ এবং চট্টগ্রাম (বাংলাদেশ), সিংহল (শ্রীলংকা) প্রভৃতি বন্দরে ব্যবসায়িক কারণে যোগাযোগ ছিল। এ পথে আরব বণিকরা নিজেদের পণ্যের সাথে নূতন ধর্ম ইসলামের বাণীও এতদ্‌ঞ্চলে সাধারণ মানুষের নিকট পৌঁছায়। একইভাবে ইসলাম ধর্মের প্রচারক এবং আল্লাহর পথে জীবন উৎসর্গকারী সুফিরাও দক্ষিণ এশিয়ায় ইসলাম প্রচারে আসেন। সাহাবা এবং তাবেয়ীন যুগের অনেকে ইসলাম প্রচারে বহির্বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েন। ইসলামের বিজয়ের পূর্বেও দক্ষিণ এশিয়ায় সুফি সাধকগণের তৎপরতায় সাধারণ জনগণ নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। ভারত মহাসাগর, বঙ্গোপসাগর এবং মালাক্কা প্রণালী হয়ে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া ও আরবদের প্রাচীনকাল থেকে সুপরিচিত বানিজ্যপথ ইসলাম প্রচারের পথকে সহজতর করেছে। রাসুল (সঃ) এ জীবদ্দশায় তামিলাডুর সমুদ্র উপকূলবর্তী মালবার রাজ্যের রাজা চেরুমল পেরুমল (Cherumal Perumal) ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।[১১] ৭১২ খ্রি. মুহাম্মদ বিন কাশিমের সিন্ধু বিজয়ের পর দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে আরব, ইরান, ইরাক, তুর্কি প্রভৃতি দেশের সুফিরা পদব্রজে ইসলাম প্রচারে আসেন। ৭১৮ খ্রি. রাসুল (সা.) এর সাহাবি তামিন আনসারি, উরচ ইবনে আসসা, আবু কায়েস ইবনে হারিসা এবং আবু ওয়াক্কাস ইবনে ওহাইব প্রমুখ চট্টগ্রামে আসেন।[১২] আরব ব্যবসায়ীরা সম্পর্কের সূত্রে চট্টগ্রাম বন্দর, চাঁদপুর নদীবন্দর, রামু, কক্সবাজারে বসতি স্থাপন করেন এবং ইসলাম ধর্মের প্রচার করেন।[১৩]

মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বে চট্টগ্রাম জেলা, ময়মনসিংহের মদনপুর, ঢাকা জেলার বিক্রমপুর ও সোনারগাঁও, পাবনা জেলার শাহজাদপুর, বগুড়া জেলার মহাস্থান, মালদহ জেলার পান্ডুয়া ও দেওকোট এবং বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট ইসলাম ধর্মের প্রচারকেন্দ্র হিসেবে বিখ্যাত ছিল। এছাড়াও দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর এর শাসনকালে (৬৩৪-৬৪৪) মামুন ও সুহায়মিনসহ একদল সাহাবী বাংলাদেশে আগমণ করেন বলে জানা যায়।[১৪] অনুরূপভাবে সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ায় আরব বণিক ও ইসলাম ধর্মের প্রচারক সুফিদের পদ চারণায় ইসলামের বাণী ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষত দ্বাদশ শতকে খাজা মঈনুদ্দীন চিশতির (রহ.) ভারতে আগমণে ইসলাম ধর্মের ব্যাপক প্রসার ঘটে। তাঁর শিষ্য দিল্লীর কুতুব উদ্দিন বখতিয়ার কাকী দিল্লিতে ইসলাম প্রচারের প্রচেষ্টা চালান। বখতিয়ার কাকীর শিষ্য শায়খ ফরিদ উদ্দিন গাঞ্জশাখর (বাবা ফরিদ) এবং তাঁর শিষ্য শায়খ নিজামুদ্দিন আউলিয়া প্রমুখের প্রচেষ্ঠায় বৃহত্তর ভারতে ইসলাম ধর্মের প্রচারে গণজোয়ারের সৃষ্ঠি হয়। নিজামুদ্দিন আউলিয়ার জীবদ্দশায় দিল্লীর সুলতানী আমলে তের জন সুলতান রাজত্ব করেন। এসব শাসকগোষ্ঠী, কবি, সাহিত্যিক, পণ্ডিত এবং অগণিত জনসাধারণ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক, সুলতান আলউদ্দিন খিলজি, সুলতান জালাল উদ্দিন ফিরোজ, কবি আমীর খসরু, ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বরানি প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। তাঁর বাঙ্গালি শিষ্য শায়খ আঁখী সিরাজউদ্দিন উসমান বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার করেন।[১৫] বাংলাদেশের ইসলাম প্রচারে শায়খ জালাল উদ্দিন তাবরেজি (গৌড় ও পান্ডুয়া), শরফ উদ্দিন আবু তাওয়ামা (সোনারগাঁ), শাহ মখদুম (রাজশাহী), বার আউলিয়া (চট্টগ্রাম), নুর কুতুবউল আলম ও আলাউল হক (উত্তরবঙ্গ), শাহ জালাল (সিলেট) প্রমুখ বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। এসব সুফিদের মধ্যে শাহ জালাল, নুর কুতুব আলম, চট্টগ্রামে বার আউলিয়াসহ অসংখ্য সুফি মুসলিম সৈন্যদের সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং ইসলামের বিজয়কে তরান্বিত করেন। সিলেটের শাহ জালাল তাঁর সাথে আগমণকারী ৩৬০ জন সুফিকে সমগ্র বাংলায় প্রেরণ করেন এবং ইসলাম প্রচারের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। বাংলায় ইসলাম প্রচারে গুরুত্বপূণ্য অবদান রাখায় শাহ জালালকে 'সুলতান-ই বাঙ্গলা' বলা হয়।[১৬] সমগ্র বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এদেশীয় এবং বিদেশ

হতে আগত সুফিগণের মাধ্যমে ইসলাম ধর্মের বিস্তৃতি ঘটে। প্রফেসর মুহাম্মদ এনামুল হকের[১৭] মতে, বাংলায় সুফি দর্শনের বিকাশ এবং ইসলামের প্রচার চারটি প্রধান কেন্দ্র থেকে সংগঠিত হয়েছে। এগুলো হচ্ছে:

এক. বরেন্দ্র কেন্দ্র (Varendra Centre) : মালদাহ, দিনাজপুর রংপুর, পুর্ণিয়া রাজমহল এবং পাশ্ববর্তী অঞ্চলসমূহ।

দুই. রাধা কেন্দ্র (Radha Centre) : বর্ধমান, মিদনাপুর, হুগলি, বীরভূম এবং বাঁকুড়া।

তিন. বঙ্গ কেন্দ্র (Vanga Centre) : ময়মনসিংহ, পাবনা, বগুড়া, রাজশাহী, ঢাকা, ফরিদপুর এবং বাকেরগঞ্জ।

চার. চট্টলা কেন্দ্র (Chattala Centre) : চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা (বর্তমান কুমিল্লা), নোয়াখালী এবং সিলেট।

এ সকল কেন্দ্র হতে অসংখ্য সুফি সাধকগণ বাংলাদেশে প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন। সমগ্র বাংলাদেশে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের অনবদ্য দৃষ্ঠান্ত স্থাপন করেছে। এ বিষয়ে লাভলী আখতার ডলির লিখিত *বাংলাদেশে সুফি দর্শনের রূপরেখা* গ্রন্থটিতে বিশদভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

দক্ষিণ এশিয়া তথা বাংলায় সুফিগণ হিন্দু,বৌদ্ধ, মুসলিম ও অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অভূতপূর্ব মেলবন্ধন রচনা করেন। এদেশীয় সর্বস্তরের জনগণের মিলনকেন্দ্র ছিল সুফিদের খানকাহসমূহ। এ সূত্রে ধনী,গরীব, উচু, নিচু, হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি নিবিড় সম্পর্কে গড়ে উঠে। ড. এনামূল হকের মতে:

> Growth of Cordiality and unity between the Hindus and the Muslims of Bengal is one of the great achievements that the sufis accomplished in this Country. From this point of view, the sufis may fairly be regarded as the connecting link of union between the rulers and ruled.[১৮]

বহুধা জাত-পাতে বিভক্ত হিন্দু জনগণকে বিজয়ী জাতি মুসলিম রাজশক্তিকে স্বাগত জানায়। কিন্তু এ স্বাগত জানানো আন্তরিক অথবা বন্ধুত্বের নিদর্শন ছিলনা। তারা মুসলিম শক্তিকে ভারতে স্বাগত জানিয়েছে নিজেদের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনকে উন্নত করার জন্য। এদেশের জনসাধারণের খাবার, জীবনাচরণ, ধর্ম ও সংস্কৃতি, ধর্মীয় বিশ্বাস সর্বক্ষেত্রে বিদেশী সূফিগণের সাথে বৈপরীত্য রয়েছে। কিন্তু সূফিদের প্রচেষ্টায় হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায় পরস্পর ধীরে ধীরে মিলনাত্মক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। এদেশের বিভিন্ন স্থানে গড়ে উঠে সূফিদের অসংখ্য আস্তানা, খানকাহ,দরগাহ, চিল্লাখানা, লঙ্গরখানাসমূহ যা জাতি, বর্ণ, ধর্ম নির্বিশেষে সকল শ্রেনি পেশার মানুষের নিরাপদ আশ্রয়স্থল ছিল। এ সকল জনহিতৈষীমূলক প্রতিষ্ঠানে মানুষ শান্তি খুঁজে পেত এবং তাদের আধ্যাত্মিক জীবনের প্রবল আকাংখা পরিতৃপ্ত হতো। খানকাহসমূহ ছিল একাধারে চিকিৎসালয় এবং আশ্রয়স্থান। যেখানে অসহায় দুঃস্থ ও রুগ্ন ব্যক্তিরা সরাসরি আশ্রয় লাভ করত। প্রতিটি খানকাহর সাথে একটি লঙ্গরখানা বা বিনা খরচে খাবার ব্যবস্থা থাকত এবং গরীব ও অভূক্ত লোকদের খাবার দেয়া হতো। সুফি দরবেশদের খানকাহ ও লঙ্গরখানা সাধারণ দুঃস্থ ও বিপন্ন মানুষের নিকট এক মহামুক্তির দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়। এসব কেন্দ্রে বিনা খরচে খাবার, চিকিৎসাসেবা ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা থাকায় সুফি-দরবেশদের সাথে এদেশীয় সাধারণ জনগণের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠে এবং মনের গভীরে স্থায়ী আসন লাভ করে। ধনী-দরিদ্র, দেশী-বিদেশী, আর্তপথিক, আগন্তুক তথা জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণির মানুষের জন্য সুফিগণ এবং তাদের খানকাহসমূহ পরম নির্ভরতার প্রতীক ছিল। এসকল স্থানে আশ্রয় গ্রহণকারী ও আগমণকারী সকলের নিকট সুফিগণ উদার ধর্মীয় ব্যাখ্যা প্রদান করতেন। যা সমাজের সর্বস্তরে

অহিংস মনোভাবের সৃষ্ঠি করে এবং এদেশীয় ধর্মীয় সম্প্রদায়সমূহকে পরস্পরের নিকটবর্তী হওয়া এবং জানার সুযোগ করে দেয়। অপরদিকে মুসলিম ছাড়াও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা সূফি দরবেশদের দরবারসমূহে গমণ, মাজার জিয়ারত এবং বার্ষিক ওরশের সময় উপস্থিত হয়ে নিজেদের শ্রদ্ধা জানানো ও মনোবাসনা পূর্ণ করার আর্জি দিত। বর্তমানেও মাইজভান্ডার দরবার শরীফসহ বাংলাদেশের অনেক আওলিয়ার দরবারে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজনকে গমণ করতে দেখা যায়। এধরণের কর্মকান্ড উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যোগাযোগ এবং সামাজিকভাবে সহাবস্থানকে নিশ্চিত করেছে।

দক্ষিণ এশিয়ায় মুসলমানগণ রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তার করলেও রাজ্য শাসনের জন্য হিন্দুদের নিয়োগ করেন। সুলতান মাহমুদের অগনিত হিন্দু সৈন্য ছিল, যারা তাঁর পক্ষে মধ্য এশিয়ায় যুদ্ধ করে এবং হিন্দু সেনাপতি তিলক মুসলমান সেনাপতি নিয়ালতিগিনের বিদ্রোহ দমন করেন। সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেক বেসামরিক প্রশাসনে অভিজ্ঞ হিন্দু কর্মচারীগণকে বহাল রাখেন। হিন্দু আইন পরিচালনার ব্যাপারে ব্রাহ্মণ আইনবিদগণ রাজাকে উপদেশ দিতেন এবং ব্রাহ্মণ জ্যোতির্বিজ্ঞানীগণ তাদের সাধারণ কাজকর্ম পরিচালনায় সাহায্য করতেন।[১৯] দক্ষিণ এশিয়ায় আগমণকারী মুসলমানগণ এটিকে নিজেদের দেশ হিসেবে গ্রহণ করেন। হিন্দু অধ্যুষিত এত্দঞ্চলে বসবাসের জন্য দেশীয় হিন্দুদের সাথে স্থায়ী মিত্রতা গড়ে তুলেন। পারস্পরিক ভাবের আদান প্রদান ও লেনদেনের মাধ্যমে সমঝোতার সৃষ্টি হয়। এভাবে মুসলিম বিজয়ের ধাক্কাটি সয়ে যাওয়ার পর হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই প্রতিবেশী হিসেবে বসবাসের উপযোগী পরিস্থিতির সৃষ্ঠি হয়। হিন্দু ধর্ম, শিল্পকলা, সাহিত্য, বিজ্ঞান কেবল মুসলমান উপাদান সমূহ গ্রহণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। হিন্দু সংস্কৃতির আসল চেতনা ও হিন্দু মানসিকতার বিষয়বস্তুও অনেকাংশে পরিবর্তিত হয়ে পড়ে এবং মুসলমানগণও প্রতিটি ক্ষেত্রে সাধিত এ পরিবর্তনের প্রতি সংবেদনশীলতা প্রকাশ করে।[২০] চর্তুদশ শতকের পরবর্তীকালে মহারাষ্ট্র, গুজরাট, পাঞ্জাব, হিন্দুস্তান ও বঙ্গদেশের ধর্মনেতাগণ প্রাচীন ধর্মব্যবস্থর কিছু কিছু উপাদান ইচ্ছাকৃতভাবে বর্জন করেন এবং অন্য উপাদানসমূহের উপর গুরুত্বারোপ করেন। হিন্দু ও মুসলমান ধর্মবিশ্বাসকে সমীপবর্তী করার চেষ্ঠা করেন। একই সময়ে মুসলিম সুফি সাধক, লেখক ও কবিগণের মধ্যে হিন্দু আচার ও তত্ত্বসমূহের সমন্বয়ের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।[২১] দক্ষিণ এশিয়া তথা বাংলায়

সুফিদের কর্মকান্ড প্রসঙ্গে ড. সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্য :

> পীর, ফকির, দরবেশ, আউলিয়া প্রভৃতিদের প্রচার এবং কেরামতীর ফলে মূখ্যতঃ ব্রাহ্মণদের প্রতি বিদ্বেষপরায়ন বৌদ্ধ ও অন্যান্য মতের বাঙালী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। ... বাঙ্গালা দেশে ইসলামের সূফীমত বেশী প্রসার লাভ করে। সূফীমতের ইসলামের সহিত বাঙ্গালার সংস্কৃতির মূল সূরটুকুর তেমন বিরোধ নাই। সূফীমতের ইসলাম সহজেই বাঙ্গলার প্রচলিত যোগমাগ ও অন্যান্য আধ্যাত্মিক সাধন মার্গের সঙ্গে একটা আপোষ করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিল।[২২]

এদেশের প্রধান দুটি সম্প্রদায় হিন্দু ও মুসলমানের পারস্পরিক সমঝোতা, সামাজিক স্থিতিশীলতা এবং মুসলিম সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক ক্ষমতা, সার্বভৌমত্ব ও রাষ্ট্রের স্থায়িত্বকে নিশ্চিত করেছে। এভাবে হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির সমন্বয়ে গঠিত সংস্কৃতি ভারত তথা বাংলার মানুষের যাপিত জীবন প্রণালী। যা বিশ্বে দক্ষিণ এশিয়ার সংস্কৃতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ঐতিহাসিক Richard M. Eaton এর মতেঃ

> In sum, the Indo-Islamic traditions that grew and flourished between 711 and 1750 served both to shape Islam to the regional cultures of South Asia and to connect Muslims in those cultures to a worldwide faith Community.[২৩]

দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে শুধু বাংলাকে বিবেচনায় নিয়ে আসলেও হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিকভাবে সমঝোতা বা সম্প্রীতির উদাহরণই বেশী পাওয়া যায়। বাংলার প্রথম স্বাধীন শাসক

সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ, গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের উত্তরাধিকারীগণ, সুলতান জালালুদ্দিন মুহাম্মদ শাহ, আলউদ্দিন হোসেন শাহ প্রমুখ মুসলিম শাসক হিন্দুদেরকে উজীর, সেনাপতি সহ রাজনৈতিক উচ্চ মর্যাদায় আসীন করেন। বিদ্বান, পন্ডিত, কবি ও লেখকদের রাজদরবারে পৃষ্ঠপোষকতা করেন। অন্যদিকে ভুলুয়ার (নোয়াখালীর) হিন্দু জমিদার অনন্ত মানিক্য, শ্রীপুরের চাঁদ রায় ও কেদার রায় মুসলমানদেরকে তাদের দরবারে যাথাক্রমে মীর্জা ইউসুফ বারলাসকে মুখ্যমন্ত্রী ও সোলায়মানকে সেনাপতি নিয়োগ করেন। আফগান দলপতি খাজা কামালকে যশোহরের প্রতাপাদিত্যের সৈন্য বিভাগের অন্যতম সেনাপতি নিযুক্ত করেন।[২৪] সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতেও উভয় সম্প্রদায় দাওয়াত, উপঢৌকন আদান প্রদান করতেন এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে উদ্‌যাপন করতেন। কবি বিজয়গুপ্ত বলেন, চাঁদ সওদাগরের পুত্র লক্ষ্মীন্দরের বিয়েতে নয়শত মুসলিম গায়ক (কাওয়াল) যোগদান করেছিল।[২৫] মুসলমানদের কোরআন, পীর দরবেশ ও পীর ফকিরদের প্রতি হিন্দুদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল। হিন্দুগণ অনেক সময় পুত্র সন্তান কামনায় প্রার্থনার জন্য কোরআন আলোচনা, হিন্দু বণিকগণ বাণিজ্য যাত্রায় আল্লাহর নাম উচ্চারণ এবং পথে নিরাপত্তার জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে বাণিজ্য যাত্রা করতেন।[২৬] কবি ক্ষেমানন্দ তাঁর *মনসা মঙ্গল* কাব্যের মুখবন্ধে বড় খাঁ গাজী ও অন্যান্য পীরের বন্দনা করেন। কৃষ্ণরাম দাসের *রায়মঙ্গল* কাব্যেও বড় খাঁ গাজীর উল্লেখ রয়েছে। হলায়ুধ মিশ্র *শেখ শুভোদয়* গ্রন্থে শেখ জালাল উদ্দিন তাবরিজের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন।[২৭] সত্যপীর মতবাদ মুসলিম বাংলার একটি উল্লেখযোগ্য সাধারণ সংস্কৃতিক ঐতিহ্য। ষোড়শ শতকের কবি শেখ ফয়জুল্লাহ সত্যপীরের মাহাত্ম্যজ্ঞাপক কাব্য রচনা করেন। আঠারো শতকের কবি ভারতচন্দ্র বলেন:

> এক ফকির জনৈক ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত হয়ে ফকিরের নামে 'শিরণী' দিতে বলেন। ব্রাহ্মণ অস্বীকার করায় ফকির অদৃশ্য হয়ে যান এবং হিন্দু ঈশ্বর 'হরিরূপ' ধারণ করে পুণরায় উপস্থিত হন এবং অতপর আবার অদৃশ্য হয়ে যান। হিন্দু ভগবান সাঁই (হরি) এবং মুসলমান 'পীর' (ফকির) প্রকৃতপক্ষে আধ্যাত্মিকভাবে এক ও অভিন্ন এ সত্য সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করে ব্রাহ্মণ অতঃপর সত্যপীরের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে এবং তাঁর নামে 'শিরণী' দেয়।[২৮]

সুতরাং বাংলাদেশে মুসলমান রাজত্বকালে সামাজিক মেলামেশা এবং সাধারণ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য থেকে তৎকালীন হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সম্প্রীতি ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের প্রমাণ পাওয়া যায়।

মুসলমানদের সামাজিক সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শ শিক্ষিত হিন্দুদের মনে বিপ্লবের সৃষ্ঠি করে। প্রসিদ্ধ কবি চন্ডীদাস হিন্দু সমাজে ন্যায় ও সাম্যের বাণী প্রচার করেন। তিনি লিখেন :

'শুনহ মানুষ ভাই,

সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'।[২৯]

বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের অনেক কবিতা ও সংঙ্গীতে সুফি ভাবধারা ফুটে উঠেছে। তাঁকে সাম্যবাদী কবিও বলা হয়। 'মানুষ' কবিতায় তিনি জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল স্তরের মানুষের অধিকার ও সাম্যের কথা বলেছেন। কবি কাজী নজরুল ইসলাম লিখেন:

গাহি সাম্যের গান

মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান।

নাই দেশ-কাল-পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্মজাতি

সব দেশে সব কালে ঘরে ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি।[৩০]

এসকল সার্বজনীন দর্শন ও চিন্তার মূলে হচ্ছে ইসলামি সমাজ ব্যবস্থায় সুফিদের ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষণ, আদর্শ, উদারতা ও আধ্যাত্মিকতা। মূলত এ সকল ধর্মীয় আদর্শ, তাহাজীব ও তমদ্দুন হতে ইসলামি সংস্কৃতির সৃষ্ঠি হয়েছে, যা সমকালীন দক্ষিণ এশিয়া তথা বাংলায়ও প্রবাহিত হয়। এসকল সংস্কৃতির মধ্যদিয়ে এদেশীয় হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায় অসাম্প্রদায়িক, সার্বজনীন, সাম্য ও মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ রয়েছে। বাউল গান, জারি গান, ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, মুর্শিদী, ফকির লালনের গান, হাসন রাজার গান, বাউল আব্দুল করিমের গান, কবিয়াল রমেশ শীলের গান, গফুর হালির গান, মনমোহন দত্তের গানসহ বাংলাদেশের অসংখ্য আধ্যাত্মিক ঘরানার গানসমূহের বিষয়বস্তু সাম্য, সম্প্রীতি ও স্রষ্ঠার প্রতি নিবেদন। এ সকল গানসমূহ আবহমান বাংলার সাধারণ মানুষের জীবন প্রণালী, সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতিফলন। তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নজীর রয়েছে এসকল সুফিতাত্ত্বিক ও বাউল ঘরানার গানে।

উদাহরনস্বরূপ বাউল আব্দুল করিমের গান-

আগে কি সুন্দুর দিন কাটাইতাম
গ্রামের নওজোয়ান হিন্দু-মুসলমান
মিলিয়া বাউল গান ঘাটু গান গাইতাম - - - ।[৩১]

অপরদিকে বাংলাদেশের বিখ্যাত সুফিতাত্ত্বিক মাইজভান্ডারি গানের কবি ও লেখকদের মধ্যে কবিয়াল রমেশ শীল সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। তিনি একজন হিন্দু ধর্মের অনুসারী হয়েও মাইজভান্ডারি দর্শনের প্রতি অনুরক্ত হন এবং মাইজভান্ডারি গান রচনায় নিজেকে ব্যাপৃত করেন। এটি সুফিদের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এবং সার্বজনীন চিন্তার বহিঃপ্রকাশ। কবিয়াল রমেশ শীলের মাইজভান্ডারি গানসমূহের আধ্যাত্মিক মূল্য অনেক গভীর। যেমন রমেশ শীলের গান:

চলরে মন ত্বরাই যাই, বিলম্বের আর সময় নাই,
গাউছুল আযম মাইজভান্ডারী স্কুল খুইলাছে।
আবাল বৃদ্ধ নর-নারী, করে সবে হুরাহুরি
নাম করে রেজিষ্টারী ভর্তি হতেছে - - - ।[৩২]

এ গানে মাইজভান্ডারি তরিকার প্রর্বতক সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভান্ডারির আধ্যাত্মিক ক্ষমতা, সর্বস্তরের মানুষকে তরিকতের শিক্ষা দান, পার্থিব ও পরকালের মুক্তি প্রভৃতি বিষয়াবলী উল্লেখ করা হয়েছে। অপরদিকে আলোক সাঁই, কানাই, শ্যাম, বৈষ্ণব পদাবলী প্রভৃতি গানেও সার্বজনীন প্রেম ও ভালবাসার কথাই রয়েছে। সুতরাং প্রাচীন যুগ, মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগে বাংলা তথা বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতিতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অসংখ্য নজীর রয়েছে। এদেশে হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খ্রিস্টান, ধর্মাবলম্বী মানুষের বসবাস। মধ্যযুগে মুসলমানদের ইসলাম ধর্মের প্রচার এবং আধুনিক যুগে খ্রিস্টান ধর্মের প্রচারের ফলে সমাজে এসকল ধর্মীয় বিশ্বাসের অনুসারীগণের বসবাস রয়েছে। কিন্তু আবহমান কালের বাঙালির সাংস্কৃতিক ধারার গুণগত পরিবর্তন খুব বেশি হয়নি। সমাজে সকল ধর্মের লোকজন শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে সক্ষম হয়। এ সমাজিক মূল্যবোধই রাষ্ট্রের মূলনীতি, আদর্শ, পরিকাঠামো, উন্নয়ন প্রভৃতিতে প্রতিফলিত হয়েছে। এরূপ সমাজ কাঠামোর মধ্যদিয়ে বেড়ে উঠা এদেশের সমাজপতি, সামন্তরাজ, রাজনৈতিক নেতা, সমাজকর্মী, কবি ও সাহিত্যিক, সাংবাদিক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধিজীবি, রাষ্ট্রনায়কগণের চিন্তা ও চেতনায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নীতিই প্রভাবিত করেছে।

দক্ষিণ এশিয়া তথা বাংলাদেশে সুফিগণ ইসলাম প্রচারের প্রাথমিক যুগে মুসলিম রাজা ও সেনাপতির সাথে সম্মুখ সমরে অংশগ্রহণ করে রাজ্য বিজয়ে সহযোগিতা করেছেন, যা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

দিল্লী সালতানাত ও মুঘল সাম্রাজ্যের অনেক শাসক সুফিদের ভক্ত, অনুরক্ত এবং মুরীদও ছিলেন। তাছাড়া মুসলিম রাজ্য/সাম্রাজ্যে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার মধ্যে সুফিগণকে হস্তক্ষেপ করতেও দেখা যায়। বাংলার ইলিয়াস শাহী বংশের সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের উত্তরাধিকারীদের দুর্বলতার সুযোগে রাজা গণেশই (রাজা কানস/কংস) ছিলেন বাংলার প্রকৃত শাসক। ১৪১৪-১৫ খ্রি. (৮১৭ হি.) তিনি সুলতান আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহকে হত্যা করে বাংলার ক্ষমতা দখল করেন এবং মুসলিমদের উপর অত্যাচার, নিপীড়ন শুরু করেন।[৩৩] এরূপ পরিস্থিতিতে সূফি নেতা নূর কুতুব আলম মুসলমানদের রক্ষা করার জন্য জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শর্কির নিকট চিঠি লিখেন। সুলতান ইব্রাহিম শর্কি এ বিষয়ে জৌনপুরের দরবেশ আশরাফ সিমনানীর উপদেশ গ্রহণ করেন এবং তাঁর সম্মতিতে সৈন্যবাহিনী নিয়ে বাংলায় আগমণ করেন। রাজা গনেশ তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে তাঁকে বাধা দেন এবং পরাজিত হয়ে আপোস করেন। নুর কুতুব আলম গনেশের পুত্র যদুকে ইসলাম ধর্মে দিক্ষিত করে জালালুদ্দিন মুহাম্মদ শাহ নামে বাংলার সিংহাসনে বসান।[৩৪] সূফিগণ কখনও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বা পার্থিব ক্ষমতার কাঙ্গাল ছিলেন না। তাঁদের এ ধরনের মোহ থাকলে এ সময়ে ক্ষমতা গ্রহণ করতেন। সুফি নূর কুতুব আলমের সময়োচিত হস্তক্ষেপের কারণে রাষ্ট্র মহাবিপদ থেকে মুক্তি পায়। অপরদিকে সিলেট বিজয়ের পর গৌড় গোবিন্দ শাহজালাল (রা:) এর কাছে আত্মসর্মপন করে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে সে অঞ্চলেই আশ্রয় গ্রহণ করেন। লাউড় রাজা, জৈন্তার রাজা ও ইটার হিন্দু সামন্ত রাজা নির্বিঘ্নে তাঁদের শাসন অব্যাহত রাখেন।[৩৫] পারস্পরিক সহানুভূতি, উদারতা ও সমঝোতার ভিত্তিতেই এ ব্যবস্থা চালু থাকে যে, তাঁরা মুসলমানদের ধর্ম প্রচারে বাধা দিবেন না। এভাবে সুদুর অতীত থেকে সিলেটে ধর্মীয় সম্প্রীতির ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে, যা সমগ্র বাংলাদেশের প্রতিচ্ছবি।

পরিবর্তিত সমাজব্যবস্থায় মুসলিম শাসকগণ সুফি দরবেশগণের খানকাহ ও মাজার গমণ করতেন। এসকল সুফিদের প্রতিষ্ঠিত মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকাহ, লঙ্গরখানাসহ বিবিধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। শুধু মুসলমান নয় হিন্দুদের মন্দির, তীর্থস্থান প্রভৃতিরও পৃষ্ঠপোষকতা করেন। এ প্রসঙ্গে তাঁরা ছোলতান পত্রিকায় 'বঙ্গীয় মোছলমান সমাজ' প্রবন্ধে লিখেন :

> মোছলমান আমলে জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে শাসন ও বিচার কার্য্য চলিতেছিল এবং মোছলমান বাদশাহগণ এছলাম ধর্ম্মবিধি অনুসারে অত্যন্ত উদারনৈতিক শাসন প্রণালী প্রবর্ত্তন করিয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়া হিন্দু প্রজা-সাধারণের পক্ষেও জায়গা-জমিদারী অর্জ্জন ও রাজপদ অধিকারে কোন বাধা ছিল না, তাই তাঁহারাও যথেষ্ট জমিদারী ও বিষয়-সম্পত্তি অর্জ্জন করেন। বাঙ্গালা দেশ জুড়িয়া একাধিক যেমন মোছলমানগণের মছদেজ, দর্গা, মাজার ও মাদরাছার জন্য ভূসম্পত্তি ওয়াকফ্কৃত ছিল। সেরূপ হিন্দু দেবমন্দির ও তীর্থস্থান সমূহের জন্যও যথেষ্ট ভূসম্পত্তি নিষ্কর দান স্বরূপ দরবার হইতে প্রদত্ত হইয়াছিল। মোছলমান আমলের পূর্ব্বে কোন হিন্দু বা বৌদ্ধ রাজার সময় হিন্দু তীর্থস্থান ও হিন্দু ব্রাহ্মণ পন্ডিতগণের নামে কোনরূপ সম্পত্তি দান স্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছিল কিনা তাহার কিছুই প্রমাণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ভারতবর্ষের সমুদয় দেবস্থানের দেবোত্তর সম্পত্তির ও বিশেষ বিশেষ ব্রাহ্মণ পন্ডিত ও রাজভক্ত হিন্দু কর্ম্মচারীগণের দানসম্পত্তির দলিল-দস্তাবেজ অনুসন্ধান করিলে মোছলমান আমলের পূর্ব্বের দলিলপত্রের নিদর্শন পরিলক্ষিত হয় না। কাশীর ন্যায় প্রসিদ্ধ হিন্দু তীর্থস্থানের সম্পত্তির দানপত্র তথাকথিত হিন্দু বৈরী সম্রাট আওরঙ্গজেব কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত।[৩৬]

দক্ষিণ এশিয়ায় মধ্যযুগে হিন্দু ও মুসলমানদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানাদি রক্ষাণাবেক্ষণ ও আচার ধর্ম পালনে জনগণের সুবিধা অসুবিধার কথা বিবেচনা করে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা করেন। এসকল কর্মকাণ্ড সর্বসাধারণের মধ্যে মিলনাত্মক ভাবধারার সৃষ্ঠি করেছে।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে সুফি দরবশেগণ ও তাদের মাজারসমূহের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। সুলতানী আমল, মোগল আমল ও ব্রিটিশ আমলে এ ধরণের প্রভাব ছিল যা ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

সম্রাট বাহদুর শাহের পুত্র ফিরোজ শাহ হযরত শাহজালালের মাজার শরীফ যিয়ারতে আসেন। সিলেটের ইংরেজ কালেক্টর মি. লিন্ডসে তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেন:

> সিলেটে পৌছাঁর পর আমলারা আমাকে জানালেন যে, সিলেটের শাসন কর্তার প্রথম কর্তব্য হযরত শাহজালাল (র.) দরগায় গিয়ে তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। ভারতবর্ষের দুরদূরান্ত হতে ধর্মপ্রাণ ব্যাক্তিরা এই দরগাহে যিয়ারতে আসেন। আমি প্রচলিত প্রথা মুতাবিক জুতা বাইরে রেখে দরগায় গিয়ে পাঁচটি মহর নজরানা দিলাম। এইরূপে অভিষিক্ত হয়ে আমি প্রজাদের অনুগত্য গ্রহণ করলাম।[৩৭]

পারস্য সম্রাট আব্বাসের সেনাপতি মীর্যা আলী কুলী বেগ রাজশাহী শহরে অবস্থিত শাহ মখদুমের দরগাহ যিয়ারতে এসে দরগার খেদমতেই নিজেকে সোপর্দ করেন। পাকিস্তান আমল হতে শুরু করে বাংলাদেশের প্রায় সকল রাষ্ট্রপতি ও জাতীয় নেতৃবৃন্দ, বিদেশী রাষ্ট্রদূত শাহ জালালের মাজার যিয়ারতে আসেন। দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ এ মাজার যিয়ারতের মাধ্যমে জাতীয় নির্বাচনের প্রচারণা শুরু করেন।

১৯৫৪ খ্রি. সৈয়দ আহমদ শাহ সিরিকোটী[৩৮] কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত চট্টগ্রামের ষোলশহরে অবস্থিত জামেয়া আহমদীয়া সুন্নীয়া মাদ্রাসা এবং খানকাহ্ এ কাদেরীয়া তৈয়্যবিয়া এদেশের অন্যতম তাসাউফ চর্চা কেন্দ্র। কাদেরিয়া ত্বরিকার অনুসারী এ কেন্দ্রের প্রাণ পুরুষ সৈয়দ আহমদ শাহ সিরিকোটী (রহ.)। তাঁর উত্তরাধিকারীগণ এদেশে আগমণ করলে লক্ষ লক্ষ ভক্ত ও মুরীদের পদচারণায় দরবারটি মুখরিত হয়। এ দরবারেও চট্টগ্রাম তথা বাংলাদেশের স্বনামধন্য মন্ত্রী, মেয়র, এমপি সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ দোয়া নেওয়ার জন্য আসেন। তাছাড়াও ব্যবসায়ী, বুদ্ধিজীবি, সাংবাদিক, চিকিৎসক, শিক্ষকসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ দরবারটিতে নিয়মিত যাতায়াত করেন। সুফিগণের উদার ও অসাম্প্রদায়িক নীতি দরবারের ভক্ত, অনুরক্তদেরকেও সমমনা করে তুলে। যা সমাজের নানা ধর্ম ও বর্ণের সাধারণ মানুষের মধ্যে ঐক্য ও সম্প্রীতির বন্ধনকে সুদৃঢ় করেছে।

১৯২০ খ্রি. ব্রিটিশ বিরোধী খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন এদেশের হিন্দু মুসলমানকে একই প্লাটফর্মে নিয়ে আসে। দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিতে লক্ষ্মৌ প্যাক্ট (১৯১৬ খ্রি.), খিলাফত আন্দোলন এবং কংগ্রেসের রাজনীতিতে মুসলমানদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব প্রদান একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। বাংলায় এ.কে ফজলুল হকের[৩৯] নেতৃত্বে শ্যামা-হক মন্ত্রীসভা অসম্প্রদায়িক রাষ্ট্রনীতির প্রথম উদহারণ। শেরেবাংলা এ,কে ফজলুল হক আইন পেশার পরীক্ষায় পাশ করার পর মাইজভান্ডার দরবার শরীফ যান। এ প্রসঙ্গে মওলানা মুহাম্মদ ফয়েজ উল্লাহ ভূইয়া লিখেন:

> শেরে বাংলা এ.কে ফজলুল হক সাহেব প্রথম ওকালতি পাশ করে মাইজভান্ডার দরবার শরীফ গিয়ে হযরত আকদাসের [গাউছুল আজম মাইজভান্ডারি] খেদমতে হাজির হন এবং উন্নতির জন্য দোয়া প্রার্থনা করেন। তিনি একদিন এক জনসভায় বলেন "গাউছুল আজম মাইজভান্ডারি (ক.) ও বাবা ভান্ডারির সুনজর যত দিন আমরা উপর বর্তমান থাকবে ততদিন কোন শক্তিই আমার মাথা নত করতে পারবে না এবং আমার জয় সুনিশ্চিত। আমি তাদের সুনজর কামনা করি।[৪০]

শেরে বাংলা এ.কে ফজলুল হকের রাজনৈতিক উত্থান ও সফলতায় মাইজভান্ডারি ত্বরিকার প্রবর্তক গাউছুল আজম সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভান্ডারি (রহ.) এর দোয়া রয়েছে বলা যায়। স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও মাইজভান্ডার দরবার শরীফ একাধিকবার (১৯৫২ ও ১৯৫৮) আগমণ করেন। ১৯৫২ সালে তিনি স্বপরিবারেই মাইজভান্ডার শরীফ আসেন এবং সৈয়দ দেলোয়ার হোসাইন মাইজভান্ডারির নিকট বাংলাদেশকে স্বাধীন করার জন্য দোয়া চাইলেন। ১৯৫৮ সালে চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি ও কেন্দ্রিয় কমিটির সদস্য এন.জি মাহমুদ কামাল সহ মহানগরের নেতৃবৃন্দ একটি জীপযোগে বঙ্গবন্ধু মাইজভান্ডার শরীফে আসেন।[৪১] ১৯৬৮ সালের ১৮ জানুয়ারি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অভিযোগে বঙ্গবন্ধু সিলেট জেলে বন্দি ছিলেন। এ সময়

জেলখানা থেকেও তিনি মাইজভান্ডার দরবারের সাজ্জাদানশীন (তৎকালীন) অছিয়ে গাউছুল আযম মওলানা সৈয়দ দেলোয়ার হোসেন মাইজভান্ডারি (রহ.) কে দোয়া করার জন্য একখানা চিঠি লিখেন এবং একশত টাকা পাঠান। চিঠিতে তিনি লিখেন,

> মামা :
>
> পত্রে আমার সালাম নিবেন, বর্তমানে আমি সিলেট জেলে আছি। আশা করি আপনি ইতিমধ্যে শুনিয়াছেন যে, আমার উপর আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে আর একখানা মামলা চাপান হইয়াছে। অথচ অনেক আগে হইতে আমি জেলে আছি। যাহার কিছুই আমি জানিনা। দোয়া করিবেন, যেন এই মিথ্যা ও বানোয়াট মামলা হইতে রেহাই পাই। ভাবিতেছি এই সবের শেষ কোথায়? যাহা হউক, জেলখানা হইতে মুক্তি পাইলে আপনার নিকট আসিব। শারীরিক ভাল আছি।
>
> ইতি
> শেখ মুজিব
> সিলেট জেল।
> বি:দ্র: আপনার জন্য একশত টাকাও পাঠালাম।[৪২]

মাইজভান্ডার দরবার শরীফ মুক্তিযুদ্ধের সময় সরবে ও নিরবে সমর্থন দিয়েছে। ১৯৭১ সালের ৫ এপ্রিল, বাংলা ২২ চৈত্র, সৈয়দ গোলামুর রহমান মাইজভান্ডারির বার্ষিক ওরশ শরীফের দিন বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উড়ানো হয়। দরবার হতে প্রায় বিশ মাইল উত্তর-পূর্বে 'ময়ূরখিল খামার' মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রানজিট ক্যাম্প হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। মাইজভান্ডার দরবারের মালিকানাধীন এ ক্যাম্পে মুক্তিযোদ্ধাদের বিনামূল্যে খাবারেরও ব্যবস্থা করা হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের খোঁজে পাকিস্তান সেনাবাহিনীও এই ক্যাম্পে তল্লাশি চালান।[৪৩] পাকিস্তান সেনাবাহিনী ব্যাপারটি জানার পর ১৯৭১ সালের ১৩ অক্টোবর সরাসরি মাইজভান্ডার শরীফে আসেন এবং মুক্তিবাহিনীকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য কৈফিয়ত তলব করেন। পথিমধ্যে কয়েকজনকে পাকিস্তানি বাহিনী হত্যাও করেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা তথা রাজনীতিতে এ দরবারের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা পরিলক্ষিত হয়। অনুরূপভাবে কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দির বাঞ্ছারামপুর গ্রামের পীর আল্লামা শাহ কামালও মুক্তিযুদ্ধে সহায়তা করেন। ১৯৭১ সালের অপারেশন জ্যাকপটের লক্ষ্যে দাউদকান্দি ফেরিঘাটে অপারেশনে অংশগ্রহণ করার পূর্বে আত্মঘাতি নৌকমান্ডোরা তাঁর বাড়িতে আশ্রয় নেন। নৌকমাণ্ডো শাহজাহান সিদ্দিকীর নেতৃত্বে ১৬ আগস্ট রাতে নৌকমাণ্ডোগণ অপারেশন সম্পন্ন করে ফিরে আসেন।[৪৪] তাছাড়া অসংখ্য সুফি ও সুফি ঘরানার জনগণ মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যোগ দেন। এভাবে দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে স্বাধীনতা ও সার্বভৌম বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশ ঘটে। বাংলাদেশের আবহমান কালের গড়ে উঠা অসাম্প্রদায়িক সমাজ, সংস্কৃতি ও সুফিদের সংস্পর্শে থাকা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের অসাম্প্রদায়িক চেতনা রাষ্ট্রীয় মূলনীতিতেও প্রতিফলিত হয়।

স্বাধীন বাংলাদেশের রাজনীতিবিদগণও বিভিন্ন সময়ে সুফি দরবেশগণের নিকট গমণ করেন এবং দোয়া কামনা করেন। বাংলাদেশের কয়েকজন প্রধানমন্ত্রী (সাবেক ও বর্তমান) মাইজভান্ডার শরীফে আগমণ করেন, যা বিশ্বস্ত সূত্রে প্রমাণিত। ইতোপূর্বে জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া মাদ্রাসা ভিত্তিক দরবারে আলীয়া কাদেরিয়াসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন দরবারে জাতীয় ও স্থানীয় রাজনীতিবিদগণের গমণ ও দোয়া কামনা করার বিষয়টি আলোচনা করেছি। এসব দরবার সার্বজনীন ও সকল ধর্মের অনুসারীর জন্য আশ্রয়কেন্দ্র। উদহারণস্বরূপ, সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভান্ডারি (রহ.) এর উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন 'আমার দরবার প্রাচ্যের বায়তুল মুকাদ্দাস, আল্লাহর ঘর, সকল জাতির মিলনকেন্দ্র'।[৪৫] সুফি দরবেশগণের দরবার জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল জাতির আশ্রয় কেন্দ্র। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির শিক্ষা সূফিগণের দর্শন, কর্ম ও শিক্ষা হতে নির্গত। এরূপ আবহে গড়ে ওঠা সমাজ-ব্যবস্থা ও নেতৃত্বের মধ্যে অসাম্প্রদায়িক চেতনাই প্রাধান্য পাওয়া স্বাভাবিক। সুতরাং স্বাধীন বাংলাদেশ একটি অসাম্প্রদায়িক

রাষ্ট্র হিসেবেই গড়ে উঠেছে। স্বাধীনতাত্তোরকালে এদেশে সাম্প্রদায়িকতার বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনাবলী লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু ১৯৪৬ সালের দাঙ্গা অথবা পরবর্তী সময়ের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ন্যায় ব্যাপক সহিংসতা এদেশে সংগঠিত হয়নি। সুতরাং স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পর একটি অসাম্প্রদায়িক ও আধুনিক বাংলাদেশই বিশ্বের নিকট পরিচিতি লাভ করেছে। এ বিষয়টি ব্যাপক গবেষণার দাবী রাখে।

তথ্যনির্দেশ:

১। *আল কোরআন*, সুরা ২: আয়াত: ১৮৬।
২। *আল কোরআন*, সুরা ৫৭: আয়াত: ৩।
৩। ড. রশীদুল আলম, *মুসলিম দর্শনের ভূমিকা*, সাহিত্য সোপান, বগুড়া, ১৯৯৯, পৃ. ৩৬০।
৪। মাইজভান্ডারী একাডেমি, *তাসাউফ*, চট্টগ্রাম, ২০১৪, আবুল ফজল মোহাম্মদ ছাইফুল্লাহ সুলতানপুরী : *সূফি ও সূফিবাদ*, পৃ. ১৫২।
৫। শেহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দী, *আওয়ারেফুল মাওয়ারেফ*, পৃ. ২০২। উদ্ধৃত, সাইফুল্লাহ সুলতানপুরী, *পূর্বোক্ত*।
৬। ইমাম কুশাইরী, *আররিসালাতুল কুশাইরী*, পৃ. ১২৬। *তদেব*।
৭। ড. রশীদুল আলম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৩৯।
৮। উদ্ধৃত, ড. রশীদুল আলম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৯৫।
৯। সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভান্ডারী, *বেলায়তে মোতলাকা*, মাইজভান্ডার শরীফ, চট্টগ্রাম ২০১৭, পৃ. ৭০।
১০। K.M. Panikkar, *India and Indian Ocean*, London, 1951, p. 22.
১১। ANMA Momin, *Sufism in Bangladesh: History and Significance, Tasawuf* Mizbhandhari Academy, Chattagram, 2014, p.73. লাভলী আখতার ডলি, *বাংলাদেশে সূফিদর্শনের রূপরেখা*, সাফা পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ৫২।
১২। *তদেব*।
১৩। *তদেব।*
১৪। লাভলী আখতার ডলি; পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬।
১৫। ড. আবদুল করিম, *ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব*, মাইজভান্ডারী একাডেমি, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯১। ডক্টর এম.এ. রহিম, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, প্রথম খন্ড, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ৫৮।
১৬। *ইসলামি বিশ্বকোষ*, ২৩শ খন্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ৬৫৬।
১৭। Prof. Muhammad Enamul Haq, *A History of Sufism in Bengal*, Asiatic Society of Bangladesh, Dacca, 1975, p.158
১৮। *Ibid*, p. 287.
১৯। ড. তারাচাঁদ, *ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা ১৯৮৮, পৃ. ৯৪।
২০। *তদেব*, পৃ. ৯৫।
২১। *তদেব*।
২২। আহমদ শরীফ, *বাঙলার সূফী সাহিত্য*, সময় প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ২৬।
২৩। Richard M. Eaton (ed.), *India's Islamic Traditions, 711-1750*, Oxford University Press, New Delhi, India, 2003, P.6.
২৪। ডক্টর এম এ রহিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৪৮।
২৫। *তদেব*,
২৬। টি.সি দাস গুপ্ত, *Some Aspects of Bengali Society*, p. 103, উদ্ধৃত ডক্টর এম. এ রহিম, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৯।
২৭। *তদেব*।
২৮। ভারত চন্দ্র, *সত্যনারায়ন ব্রতকথা*, কলকাতা, উদ্ধৃত ডক্টর এম.এ রহিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৫১।
২৯। আহমদ শরীফ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২০।
৩০। কাজী নজরুল ইসলাম, *সঞ্চিতা*, মওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ৫৮।
৩১। শুভেন্দু ইমাম (সম্পাদিত), *শাহ আবদুল করিমের রচনা সমগ্র*, বইপত্র, সিলেট, ২০১৩, পৃ. ১৬৩।
৩২। ড. সেলিম জাহাঙ্গীর (সম্পাদিত), *রমেশ শীল*, *মাইজভান্ডারী গান সমগ্রী*, মাইজভান্ডারী একাডেমি, চট্টগ্রাম, ২০১৬, পৃ. ২১৩।
৩৩। কে.এম. রাইছউদ্দিন খান, *বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা*, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ৩১৬।
৩৪। *তদেব*, পৃ. ৩১৭।

৩৫। লাভলী আখতার ডলি, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪৬।

৩৬। ইমরান হোসেন ও সুনীল কান্তি দে (সম্পাদিত), *ছোলতান পত্রিকায় বাংলার সমাজ, সংস্কৃতি ও রাজনীতি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ১৫১।

৩৭। লাভলী আখতার ডলি, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩৮।

৩৮। এ কে ফজলুল হক (১৮৭৩-১৯৬২) শেরে বাংলা নামে পরিচিত, তিনি বরিশালে জন্মগ্রহণ করেন, একজন আইনজীবি ও রাজনীতিবিদ, তিনি লাহোর প্রস্তাবে (১৯৪৬) উপস্থাপন করেন। অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রীসহ বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন করেন।

৩৯। সৈয়দ আহমদ শাহ সিরিকোটি (১৮৫২-১৯৬১) কাদেরিয়া তরিকার একজন বিখ্যাত সুফি সাধক ও ইসলাম ধর্ম প্রচারক। রাসুল (স:) এর ৩৭ তম বংশধর, তিনি পাকিস্তানের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের শেতালু শরীফ সিরিকোটে জন্মগ্রহণ করেন। বর্তমান দক্ষিণ আফ্রিকা, মায়ানমানমার (রেঙ্গুন) ও বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার ও ত্বরিকতের কাজ করেছেন।

৪০। মওলানা মুহাম্মদ ফয়েজ উল্লাহ ভূঁইয়া, *গাউছুল আজম মাইজভান্ডারীর জীবনী ও কেরামত*, মাইজভান্ডার শরীফ, চট্টগ্রাম, পৃ. ৯২।

৪১। মো: মাহবুব উল আলম, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে মাইজভান্ডার দরবার শরীফ*, চট্টগ্রাম, ২০০৯, পৃ. ৩২।

৪২। *তদেব*, পৃ. ৩৪।

৪৩। *তদেব*, পৃ. ৪৪-৪৭।

৪৪। সাইফুদ্দীন খালেদ চৌধুরী, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নৌকমাণ্ডো*, বাংলা প্রকাশ, ঢাকা, ২০২২, পৃ. ১৫৩।

Key words: গ্রীক দর্শন, তাসাউফ, সূফি দর্শন, আত্মা, খোলাফায়ে রাশেদীন, আসহাবে সুফ্ফা, গুপ্তজ্ঞান, ত্বরিকা, নওমুসলমান, মাদ্রাসা, খানকাহ্, লঙ্গরখানা, মক্তব, সূফি সাহিত্য, আধ্যাত্বিক, মরমী সংগীত, মাইজভান্ডারীগান, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি।